সত্যজিত রায় : জীবনীতথ্যচিত্র

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনীতথ্যচিত্রের বাধ্যবাধকতার একটা সীমাবদ্ধতা আছে। তাঁর চারটি জীবনীতথ্যচিত্রেই সত্যজিৎ রায় সেই দায়বদ্ধতার সীমাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেন তাঁর শিল্পীমানসের সৃষ্টির উৎস ও প্রেরণাকে উন্মোচনের প্রয়াসে। চারটি ছবির পাত্রপাত্রীদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা ; কিছুটা তাঁদের বিশেষ শিল্পবাহনের প্রকৃতি ও চলচ্চিত্রের সঙ্গে সেই শিল্পসংরূপের সম্পর্ক বিবেচনায় ; কিছুটা তাঁদের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য বিবেচনায়। তার সঙ্গে স্বভাবতই জড়িয়ে ছিল কালিক ও ব্যক্তিক দূরত্ব - সামীপ্যের পারম্পর্যও।

রবীন্দ্রনাথ ছবিতে প্রায় অভাবনীয় দক্ষতায় তিনি রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ বিবর্তন দেখিয়েছেন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। এও যেমন সত্য যে রবীন্দ্রনাথ লেখক হিসেবে সেই জাতের মানুষ যিনি আশপাশের মানুষ ও ঘটনাবর্তের প্রতি সজাগ থাকেন ও তার প্রতিক্রিয়ায় অহরহ আন্দোলিত হন, তাই স্বভাবতই সমস্ত জীবনকাল ধরে যে অনবরুদ্ধ সৃষ্টিকর্ম ও আত্মরূপান্তর রবীন্দ্রনাথের স্বভাবজ শিল্পীধর্ম, তার স্বরূপ ওই ইতিহাসমণ্ডিত বিবরণেই কেবল স্পষ্ট হতে পারে ; তেমনই আবার এও স্মরণীয় যে সত্যজিতের স্মৃতিচর্যায় বারবারই স্বীকৃত যে তাঁর ছবির মতোই তাঁরও রবীন্দ্রনাথকে অনুধাবন যথার্থই শুরু হয় কবির মৃত্যুর প্রবল অভিঘাতে। সেই অভিঘাতেই তাঁর ছবি শুরু করে সত্যজিৎ যেন তাঁর তথ্যচিত্রে তাঁর নিজের অবস্থানও প্রতিষ্ঠা করে দেন।

শিল্পী বিনোদবিহারীর শিল্পভাষার বৈভব ও ব্যাপ্তি ও বিশিষ্টতা সেভাবে সত্যজিৎকে আকর্ষণ করেনি। **ইনার আই** ছবিটি তৈরির তাৎক্ষণিক প্রণোদনা মনে রাখলে বোঝা যায়, সত্যজিৎ তখনই ওই ছবিটি তৈরির দায় উপলব্ধি করেছিলেন, কলাভবনের চত্বরে বিনোদবিহারী তাঁর শেষ সেরামিক টাইল প্রাচীরচিত্র রচনা শুরু করে দিয়েছেন খবর পেয়েই। আমার মনে আছে, কী প্রবল উত্তেজনায় শান্তিনিকেতন থেকে ভাস্কর প্রভাস সেন কলকাতায় সেই খবর নিয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছিলেন। শুধু ভাস্কর্য নয়, আন্তর্জাতিক শিল্পকলায় প্রভাসবাবুর প্রগাঢ় প্রজ্ঞা আমাকে চিরদিনই মুগ্ধ রেখেছিল। বিনোদবিহারীর কাজ ও কাজের ধরনের মধ্যেই প্রভাসবাবু একটা চলচ্চিত্রীয় মেজাজ ও ছন্দ লক্ষ করেছিলেন - যেভাবে পুরুলিয়া থেকে আনা রঙিন টাইলের টুকরোগুলি দর্শকের চোখের সামনে রঙ ও মাপের ও আকারে বিচিত্র বিন্যাসে রূপান্বিত হয়ে উঠেছিল, আর এক দৃষ্টিহীন মানুষ কী অলৌকিক দৃষ্টির যোগ তাঁর দু-হাতের, দুই করের স্পর্শে ও চালনায় তাদের সাজিয়ে চলেছেন, সেই সৃষ্টিলীলা যেন চলচ্চিত্রের নথিকরণ দাবি করে বলেই প্রভাসবাবুর মনে হয়েছিল। সেই টানেই আমার কাছে প্রভাসবাবুর আসা। আমি সঙ্গে সঙ্গেই সত্যজিৎবাবুর নাম বলায় তাঁর আগের একেবার সত্যজিৎবাবুর কাছে বিনোদবিহারী বিষয়ে ছবি তৈরির প্রস্তাব করায় তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেননি। আবার সেই প্রস্তাব তুলতে প্রভাসবাবু কোনওমতেই প্রস্তুত ছিলেন না, তাতে গুরুর অমর্যাদা হয় বলেই তাঁর বিশ্বাস! অথচ এমন একটা অভিজ্ঞতা যদি 'চিত্রিত' না থাকে তার অপূরণীয় ক্ষতিও তিনি মানতে পারেন না। তাঁরই প্রস্তাবমতোই আমি তখনই তাঁকে মৃণাল সেনের কাছে নিয়ে যাই। চিত্রকলায় তাঁর অনধিকারের ন্যায্য অজুহাতেই মৃণালবাবু প্রথমে অসম্মত হলেও প্রভাসবাবুর আগ্রহাতিশয্যে তিনি এই শর্তে উদ্যোগী হতে রাজি হন যে বিনোদবিহারীর শিল্পীসত্তা ও শিল্পকর্মের গুণাগুণ ধরিয়ে দিতে প্রভাসবাবু আদ্যন্ত তাঁর উপদেশক থাকবেন, এবং ছবিটির প্রতিপাদ্যস্বরূপ আদি বয়ানটিও প্রভাসবাবু রচনা করে দেবেন। এই আলোচনার জেরেই একদিনের মধেও ওই 'কনসেপ্ট নোট'টি প্রভাসবাবু ও আমি মিলে তৈরি করে দিলে মৃণালবাবু সেটি ফিল্মস ডিভিশন-এ পাঠিয়ে দেন; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিল্মস ডিভিশন-এর সম্মতি ফিল্মস ডিভিশন - এ পৌঁছে যায়। মৃণালবাবু প্রস্তাব ফিরিয়ে নেন।

বছর তিনেক আগে আমরা দিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট -এ বিনোদবিহারীর আজীবন শিল্পকর্মের ঐতিহাসিক প্রদর্শণী (যার অন্তর্গত ছিল অব্যাহত লুপ-এ সত্যজিতের দি **ইনার আই**) দেখতে দেখতে বারবারই ভেবেছি, ওই কীর্তির বৈভবের না হোক, তার প্রাণধর্ম তথা শিল্পদৃষ্টির কতটুকু ধরা পড়েছিল **দি ইনার আই** -তে? কে জি সুব্রহ্মণ্যন ছাড়া কে-ই বা ওই প্রদর্শনীর আগে বিনোদবিহারীর সেই একান্ত স্বকীয় প্রাণধর্ম সম্পর্কে সম্যক অব্যহিত ও সংবেদী ছিলেন ? বিনোদবিহারীর সেই সত্তা সত্যজিৎবাবুর কাছে ধরা পড়েনি। তাঁর ধারাভাষ্যে কোথায়ও একটা কোনও কথা নেই যা বিনোদবিহারীর সেই স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করে।

বিনোদবিহারীর শেষ কীর্তির রোমহর্ষক রচনানাট্যের স্বভাবচলচ্চিত্র যেমন তাঁকে আকর্ষণ করেছিল, তেমনই তারই মধ্যে সত্যজিৎ রায় পেয়ে গিয়েছিলেন তাঁর জীবনীতথ্যচিত্রের প্রস্থানবিন্দু। তিনি লক্ষ্য করেন, প্রায়অন্ধতা থেকে অন্ধতায় তাঁর সেই অমোঘ যাত্রাপথে বিনোদবিহারীর শিল্প সৃষ্টিধর্মের ভূমিতে অন্য এক মাত্রা আহরণ করেছে। ছবি আঁকার যে শিল্প একান্তভাবেই দৃষ্টিনির্ভর, সেই শিল্প যখন দৃষ্টিকে হারিয়ে স্মৃতি ও হাতকে অবলম্বন করে তখন শিল্পরচনার কাজটাও যেমন পালটে যায়, তেমনি ছবির রীতিতেও শান্তিনিকেতনী রেখার সাবলীল কমনীয় বাস্তবানুসরণ ছাড়িয়ে আরো নির্বস্তক কাঠামো বা ফর্ম্জ প্রধান হয়ে ওঠে, চীনা ভবনের দেওয়ালচিত্র থেকে কলাভবনের বাইরের দেওয়ালের মিউরালজ্ -এ এই পরিবর্তন দেখা যায়। সত্যজিৎবাবু এই অন্ধতাকেই তাঁর ছবির মুখ্য বিষয় করে তোলেন, প্রতিদৈনিক জীবনযাত্রায় অন্ধতার দায় ও ছবি আঁকার প্রাত্যহিকতায় তা কীভাবে অঙ্গীবূত হয়ে যায়, তাই নিয়েই সত্যজিৎ রায়ের তথ্যচিত্র **দি ইনার আই**। এই ছবির প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি নাটকীয় সীক্ওয়েন্স, বিনোদবিহারী হাতের ছোঁয়ায় কাগজের মাপ নেন, তাঁর আঁকার পরিসর তথা 'স্পেস' জরিপ করে নেন, তারপর সেই 'স্পেস' -কে ভরাট করেন। চোখের বদলে হাত, শুধু হাতের চেটো বা আঙুল নয়, বাহু পর্যন্ত সক্রিয়, ছবি আঁকার শারীরিক প্রক্রিয়াটাই বদলে যাচ্ছে। বিষয়ের বাছাইও ঘটে যাচ্ছে এই ক্রিয়ারই বিস্তারে। অন্ধের সতর্ক গৃহপ্রবেশ, ছবি আঁকা, টাইলের বিন্যাস, এই ক্রমান্বয়তা **রবীন্দ্রনাথ** ছবির জীবনীনির্ভর ক্রমান্বয়তা

থেকে একেবারেই আলাদা, অথচ সমান নাটকীয় - চলচ্চিত্রীয় আখ্যানের বুনটে সমান আঁটসাঁট। সেদিক থেকে **বালা** বা **সুকুমার রায়** ওই বুনটের বন্ধনে সংহত নয়। **বালা**-য় সত্যজিৎবাবু যেন মেনে নেন, ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের পরম্পরায় শিক্ষা বা শিক্ষণের ভূমিকা ব্যক্তিপ্রতিভা তথ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থেকে বেশি। তাই **বালা**-য় পরিবেশ, পরম্পরা, শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতার উপর যতটা জোর পড়ে, তাতে বালাসরস্বতী অনেকটাই চাপা পড়ে যান। যতই কর্মবহুল বা কীর্তিবহুল হোক, সুকুমার রায়ের বড়োই স্বল্পায়ু জীবনের ট্রাজেডির তীব্র যন্ত্রণাবোধই **সুকুমার রায়** তথ্যচিত্রের **তথ্যসম্ভারের** ভারকে অনুরণিত করে : কোথায় যেন সেই বোধটাই বাজতে থাকে, এত কাজ, কিন্তু সবই তো অসম্পূর্ণ, **যত কাজ ততই** তো অসম্পূর্ণ সম্ভাবনার রেশ! তথ্যভারকে বাড়িয়ে যেন ওই বোধটাকে শানিত করে **সুকুমার রায়**।

প্রথম জীবনীতথ্যচিত্র **রবীন্দ্রনাথ** -এর ক্ষেত্রে খানিকটা সময়ের দূরত্ব ছিল, রেকর্ডিং, ফ্লিমস্ট্রিপ, ছবি, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির এক বিরাট সংগ্রহ থেকে বাছাইয়ের দায়িত্ব ছিল, এমনই বহুধাব্যাপ্ত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও কর্মকাণ্ড যে তার বাহুল্যে হারিয়ে যাবার ভয় ছিল। সত্যজিৎবাবু সুকৌশলে মাত্র দু-একবারই রবীন্দ্রনাথের ভূমিকায় অভিনেতা ব্যবহার করেছেন, তাও একবারও সরাসরি মুখ না দেখিয়ে। বাকি সময় আর্কাইভাল উপাদানেই ভালো কাজ চলেছে। বস্তুত ক্যামেরার চোখ পুরোনো পাণ্ডুলিপি, কালধূসরিত ছবি, অন্য গতিতে পুরোনো চলচ্চিত্রের টুকরোয় এমন এক কালাতিক্রমী নৈকট্য আনতে পারে - অতীত - বর্তমানের এই অঙ্গাঙ্গী অন্তর্বয়ন চলচ্চিত্রভাষায় সহজাত- বিশেষত পাণ্ডুলিপিতে প্রায় স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাযুজ্য আনতে পারে যে তার বাস্তবতা কোনো অভিনীত চরিত্রায়নের চেয়ে অনেক বলিষ্ঠ হতে বাধ্য।

যেখান থেকে ব্যক্তি সত্যজিতের রবীন্দ্রনাথকে চেনার শুরু, সেই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ও শোকযাত্রা থেকেই তিনি ছবি শুরু করেন। যেহেতু তাঁর ছবির আখ্যানসূত্র রবীন্দ্রনাথের মানবিকবাদের বিকাশ, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', বাংলার গ্রামকে আবিষ্কার, জালিয়ানওয়ালাবাগ (এই সীক্ওয়েন্স -এ মানসিক উত্তেজনার বিক্ষোভের তীব্রতা আর্কাইভাল -এর সীমা ভেঙে হঠাৎ বেরিয়ে আসে এক জীবন্ত নাটকীয় পদচারণায়), শান্তিনিকেতনে নতুন শিক্ষার ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা এবং 'সভ্যতার সংকট' এই ছবির সবচেয়ে নাটকীয় পর্ববিন্দু, তাই মৃত্যু থেকে শুরু করে তার পিছনের জীবনে ফিরে যাওয়ার মধ্যে, মৃত্যুকে উত্তরণের একটা রূপকও যেন এই ছবির গঠনের অন্তর্গত হয়ে যায়। অথচ এই ধরনের কোনো রূপকের মায়ায় সত্যজিৎবাবু আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন না। এবং বারবারই তিনি খোঁজেন শিল্পের মহত্তম প্রতিমার আড়ালে তার খড়-মাটির অত্যন্ত বাস্তব শরীর; তাই ঋতুরঙ্গের যে বিচিত্রতা সুরে ও গানে এমন প্রাণময়, তার উৎস পান তিনি জমিদারি তদারকির বাস্তব দায়পালনের দিনানুদৈনিকতায়, পুরোনো আলোকচিত্রের বিবর্ণ বিন্যাসের অস্পষ্ট রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রকৃতির চিরন্তন বাস্তবের উজ্জ্বলতর প্রতিলিপির উপর যখন রবীন্দ্রসংগীত আছড়ে পড়ে, তখন শিল্পের নিরন্তর রূপান্তরসৌকর্যের একটা আদলও গড়ে ওঠে, সিনেমার রীতির মধ্যে। ঠিক তেমনিই পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি থেকে ডিজাইন -এর উন্মেষ ও সেই ডিজাইন -কে ধরেই রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার বিকাশ, এই বিবর্তনও সত্যজিৎবাবুর ছবির আরেকটি উজ্জ্বল অধ্যায়। এই অংশে সত্যজিৎবাবুর ছবির আরেকটি উজ্জ্বল দর্শকের চোখ একাগ্র কৌতূহলে অনুসরণ করে যেতে পারে রেখার নিজস্ব খেলা, রেখায় রেখা জড়িয়ে ছবির জন্ম।

শান্তিনিকেতনের পরিবেশে থিতু বিনোদবিহারীকে নিয়েই **দি ইনার আই** ছবির শুরু। দ্রুত কাটিং-এ সত্যজিৎবাবু বাস্তব নিসর্গের পরপরই বিনোদবিহারীর আঁকা সেই নিসর্গেরই প্রতিরূপ দেখিয়ে শিল্পীর প্রথম দিকের ছবির প্রেরণা ও রীতির চরিত্র ধরিয়ে দেন - ছবি যখন চোখে দেখা পরিবেশের প্রতিফলন, পরিবেশের বৈচিত্র্যেই তার বৈচিত্র্য - তাই বীরভূম থেকে নেপাল, নৈসর্গিক বৈচিত্রের বিরাট ক্ষেত্র উন্মোচিত। বীরভূমের গ্রাম, নেপালের রাস্তা, ছোটো ছোট শট, তারপরই কাট্ করে বিনোদবিহারী ছবি - গতি থেকে স্থিতি, বাস্তব থেকে ছবির বিবর্তনের একটা সহজ ছন্দ তৈরি হয়ে যায়। পূর্ণ অন্ধত্বের অন্ধকার নেমে আসাটা যেন এই ছবির আখ্যানের ক্লাইম্যাক্স্ - কালো চশমায় ঢাকা একটা চোখ ক্লো-জ-আপ থেকে আরো ক্লোজ করে ফেড আউট করার সহজতম আঙ্গিকেই সত্যজিৎবাবু এই ঘটনাটি প্রতিষ্ঠা করেন। অন্ধ শিল্পীর ছবি আঁকার সীক্ওয়েন্সটির অনেক ইঙ্গিতের মধ্যেই আরেকটি নিহিত আঙ্গিক - বাইরের দৃশ্যলোকের জায়গায় কাগজের জমিটাই এখন হয়ে ওঠে একই মানসক্রিয়া, ওই হাতড়ে হাতড়ে জমির আদল নেওয়া থেকে রেখা ও রিলীফের পরিকল্পনা। সত্যজিৎবাবু সিনেমাকে ব্যবহার করেছেন একজন শিল্পীর বিশিষ্ট প্রকাশধর্মের সারাৎসার তুলে ধরতে – এমন সযত্নে ব্যবহার করেছেন যে কথার প্রয়োজন হয়েছে খুবই কম, এমনকী বিনোদবিহারী যে কথাগুলির ছবির শেষে ফ্রেমে উদ্ধৃত – Blindness is a new feeling...a new experience...a new state of being...

সেগুলি উচ্চারিত হয়নি, ভিসুয়ল হিসেবেই ছবিতে স্থান পেয়েছে, বাণীও ছবিতে পরিণত হয়েছে।

বালা-য় শিল্পী, শিল্পরূপের বিশেষ ধর্ম ও সিনেমার ভাষায় ওই দুয়ের অন্তর্বয়নের সমীকরণ কিছুটা যেন শিথিল। ভরতনাট্যমের মহীয়সী শিল্পী বালাসরস্বতীর জন্য কি ডক্টর রাঘবনের প্রশংসাবাক্যের সত্যিই কোনও প্রয়োজন ছিল? ভারতনাট্যমের নৃত্যকলার যে পরিচিত প্রথাগত পরিবেশ বা অভিনয়ক্ষেত্র তার বাইরে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রবেলায় বালাসরস্বতীকে নাচিয়ে নৃত্যরূপের প্রকাশে বা তাঁর ব্যক্তিত্বের উন্মোচনে কি অন্য কোনো মাত্রা যুক্ত হয়েছে? বরং নৃত্যকালে তাঁর নিজের অস্বস্তিও অন্তত একবার গোচর হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে কোনও কোনও সীক্ওয়েন্স -এ যেমন আত্মীয় পরিজনের মধ্যে অত্যন্ত ঘরোয়া এক উপলক্ষে বা নৃত্যশিক্ষণের পরিস্থিতিতে চিত্রায়ণ দুর্লভ অন্তরঙ্গতা লাভ করে। কিন্তু অন্য দুটি জীবনীতথ্যচিত্রে যেভাবে শিল্পীজীবন ও শিল্পীব্যক্তিত্বই শিল্পকর্মে প্রায় জৈবিক অনিবার্যতায় উৎসারিত হয়, **বালা**-য় তা ঘটে না। ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যে শিল্পীর ভূমিকায় সেই ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য নেই, আছে দীর্ঘ পরম্পরার উত্তরাধিকার সাধনায় ও নিষ্ঠায় আত্মিক যোগ গড়ে ওঠে না? না কি মুম্বাই-এর ন্যাশনাল সেন্টার ফর পার্ফর্মিং আর্টস আর্কাইভাল মূল্যেই এই ছবিটিকে বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন, শিল্পীচেতনা ও শিল্পরহস্যের উদ্ঘাটনে নয়, তাই সত্যজিৎবাবু সংকুচিত

হয়ে রইলেন?

সুকুমার রায়ের চিত্রকলার স্থিরচিত্রমালায় সুকুমারের পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করেই সত্যজিৎ তাঁর জীবনকথায় প্রবেশ করেন। তারপর কার্যত তিনটি সূত্র যুগপৎ ধারণ করে একের সঙ্গে অন্যকে অন্বিত করতে করতে তিনি এগোতে থাকেন। প্রথম সূত্র বলতে চিত্রকলা – কিন্তু সুকুমারের চিত্রকলা নিতান্ত চিত্রকলা নয়, কথা ও ছবির মধ্যে ক্রমাগত দেওয়ানেওয়ার, কথার উদ্ভট ব্যঞ্জনা থেকে অভাবিত চিত্ররূপের উদ্ভবে, আবার সেই চিত্ররূপের স্বাধীন লীলা ও কথাচয়নে নিরবচ্ছিন্ন যে নাট্যক্রিয়া বহতা থাকে (কথা ও ছবির মধ্যে এই মিথস্ক্রিযার যে প্রাণবন্ত কৌতুক সুকুমার, অবনান্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের কাজের মধ্যে একটা নতুন সংরূপ তৈরি করেছিল, তা স্বতন্ত্র একটা তথ্যচিত্রের চমৎকার বিষয় হতে পারে) তা স্বতঃস্ফূতভাবেই অভিকৃতির স্তরে পৌঁছে যায়; তারই সূত্রে সুকুমারের কথার অন্তর্নিহিত নাটকীয়তা 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', ঝালাপালা-র অন্তর্গত কেষ্টা - পণ্ডিতমশায়ের সংলাপ বা হয়বরল-র অংশবিশেষ পর্দায় অভিনীত হয়ে চিত্রকথার ওই মৌলিক চারিত্র্যকে চিত্রায়িত করে। দ্বিতীয় সূত্রে প্রশান্তচন্দ্র, হিরণকুমার আদি বন্ধুগোষ্ঠী সহযোগে রসামোদী মননসাধনার ক্ষেত্রে – এই সূত্রে সত্যজিতের অবলম্বন মণ্ডা ক্লাবের আমন্ত্রণলিপির বিচিত্র বয়ানের সমাহার, আর তার মধ্যেই পাত্র, বিষয়, মেজাজের সমাজ - সামাজিকতা, তার অন্তর্লীন বিবাদী স্বরক্ষেপ। তৃতীয় সূত্রে স্বল্পায়ু জীবনে মেধাবী সৃষ্টিপ্রাচুর্যের অভিযান, যার পিছু পিছু মৃত্যুর অমোঘ পাশব অনুসরণ। তিনটি সুত্রেরই ক্লাইম্যাটিক সূত্রসন্ধি ঘটে মৃত্যুর আগে সুকুমারের কাছে রবীন্দ্রনাথের আগমনের স্মৃতি ও কবির উপর সেই অভিজ্ঞতার অভিঘাতের বিবরণ ও সুকুমারের নিজের কবিতায় – 'মেঘমুলুকে ঝাপ্‌সা রাতে,/ রামধনুকের আব্‌ছায়াতে,/ তাল বেতালে খেয়াল সুরে,/ তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।...' ছবি - কথার দ্বৈত ইঙ্গিতময়তা, মেধা ও রসবোধের সাযুজ্যে সামাজিকতার জীবন্ত চর্চা, কীর্তি ও মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ পারম্পর্য, তিনটি সূত্রই একাকার হয়ে যায় ওই সীক্ওয়েন্স -এর ভাবগাম্ভীর্যে ও ইভকেটিভ শক্তিতে।

প্রথাগত জীবনীতথ্যচিত্রের ফাঁদে পড়তে সত্যজিৎ কখনই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই চারটির মধ্যে তিনটিতেই শিল্পীবিশেষ ও তাঁর নিজ শিল্পচর্চার মধ্যে একটা বিশিষ্ট সম্পর্ক আবিষ্কার করে তিনি তা বয়নের একটা পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন। তাতেই তাঁর এই ছবি কটির মূল্য। জীবনীতথ্যচিত্রের, বিশেষত শিল্পীর জীবনীতথ্যচিত্রের, পরিমণ্ডলে ভারতীয় চলচ্চিত্রে ব্যর্থতার দৃষ্টান্তই বেশি হলেও মণি কাউলের অসামান্য **সিদ্ধেশ্বরী** বা শান্তি চৌধুরীর **হুসেন**, সত্যজিতের **রবীন্দ্রনাথ** ও **দি ইনার আই** শিল্প - শিল্পী - মানসের দ্বান্দ্বিকতায় একটি বিশিষ্ট সংরূপের মর্যাদায় অবলীলায় স্থান করে নেয়।*

*লেখাটি পুরোপুরি নতুন নয়; শীতলচন্দ্র ঘোষ ও অরুণকুমার রায় সম্পাদিত সত্যজিৎ রায় : ভিন্ন চোখে (কলকাতা , ১৯৮০) গ্রন্থে সংকলিত 'সত্যজিৎ রায় : তথ্যচিত্র' প্রবন্ধটির বেশ কিছু বাক্য এখানে হুবহু অন্তর্গত হয়েছে। লেখাটি লিখবার সময় প্রাসঙ্গিক কিছু সূত্র ও উদ্ধৃতি খুঁজে বার করে দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়ে রইলেন শ্রীমতী তূর্ণা পাইন ও শ্রীতরুণ পাইন। বর্তমান লেখাটির দুই-তৃতীয়াংশ আনকোরা নতুন। আগের লেখাটির বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তও বর্তমানে বর্জিত।